ISSN 2789-1062

পুনম মুখার্জি*

# মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী এপার বাংলার বাংলা সাহিত্য ও তার অভিঘাত

[প্রবন্ধটিতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে ভারত ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন, রাষ্ট্রচিন্তা, মতাদর্শিক টানাপোড়েন এবং তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার উপর কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তার একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব দুই বাংলার বাঙালি সমাজে গভীর আবেগ সৃষ্টি করে। এপারের সাহিত্যেও বঙ্গবন্ধু এক অনুপ্রেরণার প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হন। কবিতা, গল্প ও নাটকে তাঁর চরিত্র, নেতৃত্ব ও জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রতিফলিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামো, খাদ্যসংকট, শরণার্থী পুনর্বাসন, অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা রাষ্ট্রকে চাপে ফেলে। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্য নিহত হলে এ ঘটনা দুই বাংলার বাঙালির মানসে গভীর অভিঘাত সৃষ্টি করে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা বিষয়ক সাহিত্যচর্চার ধারা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে যায়। স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন যেমন একসময় সাহিত্যকে উদ্দীপিত করেছিল, তেমনি স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক বাস্তবতা সেই সাহিত্যিক ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক সাহিত্য প্রত্যাশিত ধারাবাহিকতা ও গভীরতায় বিকশিত হতে পারেনি। একাত্তর-পরবর্তী সাহিত্যকে বুঝতে হলে রাজনৈতিক ইতিহাস, রাষ্ট্রীয় নীতি ও সামাজিক বাস্তবতার সমন্বিত পাঠ অপরিহার্য-এই তাত্ত্বিক অবস্থানই প্রবন্ধটির প্রধান বিষয়।

সূচক শব্দ : সাহিত্য, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ, ভারত, রাজনীতি]

মৈত্রেয়ী দেবী *এত রক্ত কেন?* গ্রন্থে লিখেছিলেন-

বাংলাদেশ সম্বন্ধে লেখা অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস লেখা। ....বাংলাদেশের জন্মকথা লিখতে গেলে এই উপমহাদেশের পুরনো ইতিহাস একটু বিশদ করে লিখবার দরকার আছে।[১]

** পি এইচ ডি গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়*

১৯৭১ সালে পশ্চিমবাংলার সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরা পর্যন্ত পূর্ববাংলার বাঙালির দুঃখে আবেগতাড়িত হয়ে উঠেছিল। একাত্তর সালে প্রচুর সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে। দেশভাগের পর দুই বাংলাতে কখনও সম্পূর্ণ শান্তি ফিরে আসেনি। ১৯৪৭-এর পর ১৯৫০ সালে দাঙ্গা হয়। পঞ্চাশ সালে দাঙ্গা বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গে *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র কয়েকটি হেডলাইন ছিল এইরকম- ২৫ মার্চ 'মুসলমানদের আপত্তিকর আচরণ'।[২] 'বর্ধমানে মুসলমানের গৃহ হইতে বহু এসিড, তরবারি, বর্শা প্রভৃতি উদ্ধার।'[৩] ২৬ মার্চে *যুগান্তর* পত্রিকার ৪ নম্বর পৃষ্ঠায় একটি সংবাদের শিরোনামে পূর্ববঙ্গের 'মৈমনসিংহ জেলায় পাকিস্তানি উপদ্রব হিন্দুদের কয়েকটি গ্রাম ত্যাগ'[৪] প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ দুই বঙ্গের পরিবেশ সাম্প্রদায়িকতার কালো ছায়াতে ঢেকে ছিল। ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ থেকে হজরত মহম্মদের (সঃ) রক্ষিত কেশ চুরি যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলায় দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের খবরগুলি পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সাম্প্রদায়িক অশান্তি হিংসার কারণে বহু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছিলেন। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গাতে উভয় বঙ্গেই বহু প্রাণক্ষয় ঘটেছে। বহু মানুষ শরণার্থী হিসাবে ঘর ছেড়েছিলেন।[৫] ১৯৭১ সালের আগে থেকে গৌরী আইয়ুব, মৈত্রেয়ী দেবী, পান্নালাল দাশগুপ্তের মতো লেখক, শিল্পী পূর্ববাংলার সঙ্গে পশ্চিমবাংলার একটি সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন বা রবীন্দ্রসংগীতের পুনরুত্থান ঘটানোর চেষ্টার মতো সাংস্কৃতিক আন্দোলন খবর সেই সময় সঠিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ বা সাংস্কৃতিক-কর্মীদের মধ্যে এসে পৌঁছাত না। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রেণির খবরের কাগজগুলিও এই বিষয়ে তেমন সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। ১৯৭১ সালে ২৫-এ মার্চের পরে অবশ্য পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আসে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় ময়দানের একটি সমাবেশের কথা লেখা হয়েছিল- "ওদের পাশে গিয়ে লড়বো, আমরাও রক্ত দেব।"[৬] প্রথম শ্রেণির সংবাদপত্রগুলি ছাড়াও বহুল এবং স্বল্প প্রচারিত সাময়িক পত্রগুলিতে সমগ্র একাত্তর সাল ধরেই প্রচুর লেখালেখি সংকলিত হয়েছে। বাংলাদেশে চলা যুদ্ধের খবর সাধারণ মানুষের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলির পাশাপাশি সাময়িকপত্রগুলিও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। ব্যক্তিগত বা অনেক সময় সমমানসিকতা সম্পন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর দ্বারা সাময়িকপত্রগুলি পরিচালিত হয় এবং পত্রিকা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর কাছে সেগুলির গ্রহণযোগ্যতা

থাকে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত প্রায় প্রতিটি সাময়িকপত্রে একাত্তর সালে পূর্ববাংলার খবর স্থান পেয়েছে। ১৯৬৫ সালের পর থেকে যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ পূর্ববাংলার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ছিল তাও বহু অংশে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পর বাঙালি সত্তার জাগরণ সেই ছিন্ন সুতো জোড়া দিতে কাজে লাগে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল সাহিত্যিকেরাই পূর্ববাংলার সংঘটিত এই গণ-আন্দোলনের বিষয়ে কলম ধরেছিলেন। একাত্তর সালের সূচনা পর্ব থেকে অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ২৫ মার্চের আগে থেকেই বহু মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতের বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে আশ্রয় নিচ্ছিলেন। মার্চ মাসের শেষের দিক থেকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহু মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকাগুলিতে যেখানে পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমান সাংস্কৃতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবীদের লেখালেখি সেভাবে ছাপা হত না, সেখানে প্রচুর পরিমাণে পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমান লেখকদের লেখালিখি স্থান পেতে থাকে। অমৃত-র বিশেষ বাংলাদেশ বিষয়ক সংখ্যাতে এম. আর. আখতার, মহম্মদ নুরুল হুদা, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, শেখ আতাউর রহমান ও মজহারুল ইসলামের লেখা প্রকাশিত হয়েছে।[৭] *অমৃত* ছাড়াও *পরিচয়* পত্রিকায় সৈয়দ আব্দুল হক, আতাউর রহমান, গোলাম কুদ্দুস ও আনিসুজ্জামানের লেখা প্রকাশিত হয়েছে।[৮] কেবল পূর্ববাংলার লেখকদের লেখালেখি নয়, পশ্চিমবাংলার প্রথম শ্রেণির পত্রিকাগুলিতে স্বাধীন বাংলাদেশ বিষয়ক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। *অমৃত* ছাড়াও *পরিচয়* পত্রিকায় দুটি বাংলাদেশ সংখ্যা হয়েছে। *জয়শ্রী*, পান্নালাল দাশগুপ্তের *কম্পাস*, মৈত্রেয়ী দেবীর *নবজাতক*, নদিয়া থেকে প্রকাশিত *হোমশিখা* পত্রিকায়, পূর্ববাংলার লেখক-সাংস্কৃতিক-কর্মীরা নিজস্ব ধারার লেখালিখির পাশাপাশি বাংলাদেশ বিষয়ক সমস্যাগুলোকেও তুলে ধরেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক-কর্মী বুদ্ধিজীবীরাও নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকেননি। বাংলাদেশ গঠন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও লেখালেখির মাধ্যমে।

একাত্তর সালের প্রথম পর্ব থেকেই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রেণির সংবাদপত্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গি পালটে যায়। মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের গণমাধ্যমে একাত্তর সালে রচিত সাহিত্য নিয়ে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের *মুক্তিযুদ্ধ: একাত্তরের সাহিত্য ও পশ্চিমবঙ্গ* গ্রন্থে একটি দীর্ঘ ভূমিকা আছে।[৯] পত্র-পত্রিকাতে প্রচুর সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ ও দীর্ঘ কবিতা লেখা হয়েছে।

অন্নদাশঙ্কর রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, মৈত্রেয়ী দেবী সহ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রেণির সাহিত্যিকরা এই কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন।

*আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় ২০২২ সালের ১৬ অক্টোবর ১৪-র পাতাতে নিজস্ব প্রতিবেদনের শিরোনামটি ছিল- '৭১-র গণহত্যার স্বীকৃতি দাবি করে প্রস্তাব আমেরিকায়'। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংগঠিত গণহত্যার স্বীকৃতির দাবি বাংলাদেশ বহুদিন থেকে করে আসছে। উক্ত নিজস্ব প্রতিবেদন থেকে জানতে পারছি ওহায়োর সদস্য স্টিভ সাবো আমেরিকার প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাবটি পেশ করে টুইটে লিখেছিলেন-

আজকের বাংলাদেশে পাকিস্তানের সেনারা যা ঘটিয়েছিল, তা নাৎসিদের ইহুদি হত্যার মতো গণহত্যাই। বহু লক্ষ মানুষকে তারা হত্যা করেছিল, যাদের প্রায় সকলেই বাঙালি এবং ৮০ শতাংশই হিন্দু ধর্মাবলম্বী।[১০]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছরের বেশি সময়কাল অতিবাহিত। ১৯৭১ সালে মাত্র একবছরের সময়পর্বে যে বিশাল মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক সাহিত্যভাণ্ডার ভারতের বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে দেখা গিয়েছিল, বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছরে সেই ধারায় সাহিত্য রচনা হয়েছে চোখে পড়ার মতো কম। BBC News বাংলাতে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কেন পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য-সিনেমায় উপেক্ষিত' এই শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের নামি অধ্যাপক, সাহিত্যিক চিত্রপরিচালকদের এই উপেক্ষার কারণ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। নামি প্রকাশক ও বইমেলার সংগঠক ত্রিদিব চ্যাটার্জী স্বীকার করেছিলেন যে মুক্তিযুদ্ধ চর্চা এপারের বাংলা সাহিত্যে সেভাবে হয়নি। তিনি জানিয়েছিলেন−

১৯৭১ আর তার ঠিক পরবর্তী সময়ে কিন্তু বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস আমার মনে পড়েছে, যেগুলো মুক্তিযুদ্ধকে নিয়েই লেখা হয়েছিল। প্রফুল রায়, শঙ্কর এঁদের উপন্যাসগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়াও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর সমরেশ মজুমদারের লেখায় মুক্তিযুদ্ধ এসেছে। কিন্তু নবীন প্রজন্মের যে লেখকরা, তাঁরা কেউ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখেছেন বলে মনে করতে পারি না। আশির দশকের মধ্যভাগের পরে তো কেউ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তো কেউ লেখেনইনি।[১১]

দীর্ঘ এই সময়পর্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক আলোচনা পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্র বিশেষত সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে কিছু পরিমাণ হয়েছে। 'সাবো'

বাংলাদেশ গণহত্যার তুলনা করেছিলেন নাৎসিদের ইহুদি হত্যার সঙ্গে। নাৎসিদের দ্বারা সংঘটিত হলোকাস্ট পৃথিবীর ইতিহাসে সংঘটিত সবচেয়ে লজ্জাজনক ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম। গণহত্যার কথা উঠলে সেই বিষয়টি সবার আগে মনে আসে। বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা নিয়ে সে তুলনায় চর্চা হয়েছে অপেক্ষাকৃত কম। বাংলাদেশের স্বাধীনুার ৫০ বছর উপলক্ষে প্রকাশিত দুই একটি বই ও পত্রিকায় আলোচিত বিষয়গুলি লক্ষ করা যেতে পারে। প্রথমেই উল্লেখ করতে পারি পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত *অনুসন্ধানে মুক্তিযুদ্ধ* গ্রন্থটির কথা। এই গ্রন্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা মূলক প্রবন্ধ থাকলেও, ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সংঘটিত গণহত্যা সম্পর্কে সেভাবে আলোচনা করা হয়নি।[১২] এরপর উল্লেখ করতে পারি ত্রিপুরা থেকে ১৪২৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত *মুখাবয়ব* পত্রিকার 'বঙ্গবন্ধু ১০০' সংখ্যাটির কথা। পত্রিকার বিশেষ শিরোনাম স্পষ্ট করে পত্রিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে। আলোচনামূলক প্রবন্ধ, গল্প, স্মৃতিমূলক রচনাগুলিতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে স্থান পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক আলোচনা, কিন্তু এখানেও গণহত্যা ও শরণার্থী সমস্যা বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রবন্ধ সংযুক্ত হয়নি।[১৩] পশ্চিমবঙ্গের একটি অতি পরিচিত প্রকাশনী তাদের *আজকের গাঙচিল পত্রিকা*-র 'মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক সংখ্যায় মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের জনক মুজিবুর রহমানের কথা থেকে শুরু করে কলকাতার বৌদ্ধিক সমাজের অবদান, উপন্যাস-সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবের মতো বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার এই বিশাল সংখ্যায় গণহত্যার বিষয়টি সেভাবে চর্চিত হয়নি।[১৪] এই দুটি কাজই ২০২২ সালে প্রকাশিত। তবে বাংলাদেশ বিষয়ক কাজের ক্ষেত্রে গণহত্যা এবং কোনও কোনও সময় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চর্চা না হওয়ার প্রবণতাও নুন কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিগত প্রায় ২০ বছরে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকার কথা এই বিষয়ে উল্লেখ করা যায়। ১৯৯৬ সালে অর্ধেন্দু চক্রবর্তী সম্পাদিত *আবর্ত* পত্রিকার বিশেষ বাংলাদেশ সংখ্যাতে 'বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানি' শীর্ষক শিরোনামে একটি মাত্র প্রবন্ধে সামান্য কিছু অংশ মুক্তিযুদ্ধের কথা এসেছে। শিবপ্রসাদ সমাদ্দারের পুরো লেখাটিই প্রায় আবর্তিত হয়েছে পাকিস্তানের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গ।[১৫] সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়ের *জিজ্ঞাসা* পত্রিকার ত্রয়োদশ বর্ষ মাঘ-চৈত্র ১৩৯৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বাংলাদেশ বিষয়ক সংখ্যাতে মুক্তিযুদ্ধ শিরোনামে বা সরাসরি উক্ত বিষয়ে কোনও লেখা নেই।[১৬] ১৪০৬ বঙ্গাব্দের শারদ *উত্তরধ্বনি*-র বাংলাদেশ সংখ্যাতে শুভ রহমানের 'সাংবাদিকদের চোখে মুক্তিযুদ্ধের কিছু কথা' শিরোনামে একটি মাত্র লেখা স্থান পেয়েছে।[১৭] *দীপন* ২০০7 সালের 'হৃদয়ে বাংলাদেশ' শিরোনাম সংখ্যাটির

সম্পাদনা করেছেন রবিউল করিম, এন জুলফিকার। পুরো সংখ্যাটিতে অনুবাদ গল্পই স্থান পেয়েছে।[১৮] ১৪২৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত *বলাকা বিষয় বাংলাদেশ সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি* পত্রিকাটিতে মোঃ মোফাকখারুল ইকবালের 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে কলকাতার ভাবনা সমূহ' শিরোনামে যে লেখাটি রয়েছে, সেখানে মূলত কলকাতার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছু ছাপ চোখে পড়ে। আর একটি লেখা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। 'চলচ্ছবি ও মুক্তিযুদ্ধ' শিরোনামে লিখেছেন রিয়া চক্রবর্তী।[১৯] মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত কয়েকটি বাংলাদেশি সিনেমার বর্ণনা প্রবন্ধে এলেও সেই সব সিনেমায় গণহত্যার দৃশ্য বা প্রেক্ষাপটের কোনও বর্ণনা নেই। এছাড়া ২০১৯-এর আগস্ট-নভেম্বরে প্রকাশিত এবং *জলঘড়ি* পত্রিকার 'প্রসঙ্গ বাংলাদেশ' নামাঙ্কিত ক্রোড়পত্রটির কথা। এই ক্রোড়পত্রটিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তিনটি লেখা আছে। প্রথমটি 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিঃ স্মৃতি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা' নামে দাউদ হোসেনের লেখা। 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও আকাশবাণী' নামে ভবেশ দাশের প্রবন্ধ আর শেষ প্রবন্ধটির নাম 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের রাজনৈতিক দর্শন', প্রাবন্ধিকের নাম আবুল খায়ের।[২০] উপরোক্ত উদাহরণগুলি দেওয়ার মাধ্যমে, বিগত বছরগুলিতে এপার বাংলায় হওয়া বাংলাদেশ বিষয়ক চর্চার ধারাকে চিহ্নিত করা হল। ভাষাগত ক্ষেত্রে দুই বাংলার মানুষ একই ভাষা ব্যবহার করেন। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল এই বঙ্গে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় এই ধারার ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ২০২৩ সালে প্রকাশিত *পড়শি* পত্রিকার 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা' সংখ্যাটির কথা। মৃদুল হক ও সঞ্চিতা দত্ত সম্পাদিত এই পত্রিকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক দিকের পাশাপাশি গণহত্যার হিংস্র ও বর্বর অত্যাচারের দিকগুলিও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছে। সম্পাদকীয় অংশে একাত্তর পরবর্তী সাহিত্য সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত দেওয়া হয়েছে–

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন গণহত্যা ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রায় অনুচ্চারিত একটি শব্দ, যেমন বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দেশভাগ। মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কিছুটা চর্চা শুরু হয়েছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, দেবেশ রায়, শঙ্খ ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর সেন, অমিতাভ দাশগুপ্ত, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী দেবী প্রমুখ ব্যক্তির হাত ধরে, কিন্তু তার পরে একেবারেই এই নিয়ে কথা বলা হয় না এপারে। অথচ প্রায় ৩০ লক্ষ বাঙালির হত্যার ইতিহাসকে আমরা কী করে প্রতিবেশী দেশের বাঙালি হয়েও প্রায় ভুলতে বসেছি। এই আশ্চর্য নীরবতার কারণ খুঁজে দেখার জন্য এপার বাংলায়

সেই অর্থে আজও কোনও সুষ্ঠু তরিকা গড়ে ওঠেনি।[২১]

দীর্ঘ সময়পর্বে একাত্তরকেন্দ্রিক সাহিত্যধারা স্তিমিত হয়ে আসার কারণ সমূহ নিম্নে আলোচনা করা যেতে পারে।

**১.১ সামাজিক প্রতিক্রিয়া**

১৯৭১-এর যুদ্ধে সাধারণ জনগণের মধ্যে আবেগ ও সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে সব থেকে বেশি লেখা হয়েছে কবিতা, তারপর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অভিমত ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থমূলক রচনা। একাত্তর সালে এপারের সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্যকৃতির আলোচনার মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনার ধারা স্তিমিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

*জয়শ্রী*, *শারদীয় কালান্তর*, *অমৃত*, *পরিচয় ও নন্দন*–এর মতো সাময়িক পত্রিকাগুলিতে একাত্তর সালে প্রকাশিত কবিতা বা প্রবন্ধের পাশাপাশি বেশ কিছু ছোটগল্প ও নাটক প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলি রচনা করেছেন মূলত পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী সাহিত্যিকরা। সাহিত্যকেন্দ্রিক লেখালিখির মধ্যে কবিতা ও স্মৃতিকথার ভাগ সবচেয়ে বেশি। পশ্চিমবঙ্গে সমগ্র একাত্তর সাল জুড়ে যত প্রকারের সাহিত্যরূপের সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে গল্পের সংখ্যা অন্যান্য মাধ্যমগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসের যোগ নিবিড়। ঐতিহাসিক ঘটনা অনেকক্ষেত্রে গল্প-কাহিনির মধ্য দিয়েই পাঠকের কাছে পৌঁছে যায়। গল্পগুলি আমাদের এমনভাবে তথ্য পরিবেশন করে যা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মানসিক সংযোগ তৈরি করে। গল্পকারের সঙ্গে, বিশেষত সেই গল্পকার যদি কোনও নির্দিষ্ট সময়কে বুঝতে সাহায্য করেন, তবে গল্পগুলির মধ্যে পাঠকও নির্দিষ্ট সেই সময়পর্বকে বুঝতে পারে। যেহেতু গল্পগুলি একটি মানসিক সংযোগ তৈরি করে, তার দ্বারা আমরা অন্য মানুষের অভিজ্ঞতার গভীর উপলব্ধি অর্জন করতে পারি।

*সাহিত্যপত্র নহবৎ* পত্রিকার ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংখ্যায় বিশ্বজিৎ চৌধুরীর ‘মুক্তিযুদ্ধ’ নামাঙ্কিত একটি গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পের বিষয়বস্তুর লক্ষ করলে দেখা যায়– গল্পের শুরুতেই কফি হাউসের আড্ডায় মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে বাঙালি হত্যার কথা ওঠে। কলকাতার কবি বাঙালি হওয়ার আবেগে ভেসে কবিতা লেখেন। কিন্তু গল্পের কথক যখন তার বন্ধু কবিকে, কবিতার বিষয়বস্তুর গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন করেন তখন বন্ধুটি উত্তর দিতে পারে না। শুধু গল্পের বন্ধু চরিত্রটি নয়, গল্প কথক নিজেও এই শূন্যতা

অনুভব করে। কথকের মনে পড়ে দু'দিন ধরে সংবাদপত্রের প্রকাশিত বাঙালির লাশ, ধর্ষিত মেয়েদের ছবির কথা। পাশাপাশি সল্টলেকে ডুরে শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলার ছবিও মনে পড়ে। কিন্তু এসবের পরেও স্বাভাবিকভাবেই বিয়ের সামাজিক অনুষ্ঠান হয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনে প্রায় কোনও পার্থক্য চোখে পড়ে না।[২২] একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ এপার বাংলায় এক ধরনের আবেগ সৃষ্টি করেছিল। মৈত্রেয়ী দেবী *এত রক্ত কেন?* গ্রন্থে লিখেছিলেন–

পশ্চিমবঙ্গের সেই মুহূর্তে সাম্প্রদায়িকতা বলে কিছু ছিল না। বরং কোন বাংলাদেশী মুসলমানকে সাহায্য করতে পারলে, আশ্রয় দিতে পারলে, প্রত্যেকে গর্ব অনুভব করত। প্রায় স্ট্যাটাস সিম্বল আর কি![২৩]

পূর্ববঙ্গে ঘটে চলা মুক্তিযুদ্ধ সাময়িক আবেগের জন্ম দিয়েছিল। আবেগসর্বস্ব বাংলাদেশের মানুষের জন্য সাহয্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার অন্তঃসারশূন্যতা একাত্তর সালে রচিত গল্পটির মধ্যেও স্পষ্ট।

এই যে একস্তরের মানুষের মধ্যে মূল ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে অন্তঃসারশূন্যতা, সেই কারণটি কোথাও না কোথাও পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গে রচিত সাহিত্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বা গণহত্যার মতো বিষয়গুলি চর্চিত না হওয়ার একটি কারণ। সামাজিক স্তরে দীর্ঘকালীন সময় ধরে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চর্চার প্রভাব পড়েনি। শুধু এই একটি মাত্র গল্প নয় আরও কিছু উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত *অনুষ্টুপ* পত্রিকার একটি সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে সাংবাদিক এবং কবিদের অতিশয়োক্তি, রচনার গুণগতমান কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষতি করেছে। অনুষ্টুপ পত্রিকার 'বন্দীবিবেক' শিরোনামে লেখা হয়েছে–

এর মধ্যে প্রায়ই আমাদের একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আপনারা বাংলাদেশ সংখ্যা বার করেছেন না? না আমাদের বাংলাদেশ সংখ্যা প্রকাশ করার কোন ইচ্ছাই হয়নি। কেননা যে আবেগ প্রবণতা সামান্য সময়ের ব্যাপার সে বিষয়ে অন্যান্যদের মতো তাৎক্ষণিক এক আবেগ প্রবণতায় তাড়িত হবার কোন বাসনাই হয়নি আমাদের। তাছাড়া কতিপয় ক্ষুদ্র পত্রিকা ব্যবসায়ী মুজিবের ছবি বিক্রির মতো করে প্রচুর কাগজ বার করছেন। কারণ হিড়িক অনুযায়ী নিজের কিছু কবিতা ছাপানো। আমরা মাঝে মাঝে বিস্ময় প্রকাশ করি যখন দেখি এক বিশাল পরিশ্রমের ফসল ছেলেমানুষী নেমন্তন্ন পাতায়।[২৪]

এই আবেগপ্রবণতা ছিল একটা নির্দিষ্ট সময়ে তৈরি হওয়া ক্ষণস্থায়ী মানসিক অনুভূতি। দূর ভবিষ্যতে তার পরিণাম তৎকালীন সময়ের মতো নাও হতে পারে। ৩ জুলাই ১৯৭১ *দেশ* পত্রিকার 'সাহিত্য সংবাদ' কলমে 'সনাতন পাঠক' ছদ্মনামে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই কালের পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টিশীল সাহিত্যকদের মানসিক অবস্থার বেদনাভারগ্রস্থ আততির পরিচয়ক যেন ভাষা দিয়েছিলেন-

লিখিতে হলে এখন এই একটাই বিষয়। অথচ এই বিষয় নিয়ে কিছুই লেখা নেই। সমস্যাটা এত বিশাল যে ভাবতে গেলেই মন অসাড় হয়ে যায়।

বাংলাদেশের এই ঘটনা নিয়ে বাংলায় দৃষ্টিমূলক সাহিত্য খুব কমই আমার চোখে পড়েছে। কবিতা অবশ্য লেখা হয়েছে অনেক, তাও প্রথম দিকে। কবিরা একটু বেশি ভাবপ্রবণ হয়....। এখন কবিতা লেখার জোয়ারও কমে এসেছে। গল্পে উপন্যাসে বাংলাদেশ অনুপস্থিত। চিহ্ন দেখলেই বোঝা যায়, এটা ভুলে যাওয়া নয়, ভুলে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা। লেখকদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলেও কথাবার্তায় বাংলাদেশের প্রসঙ্গ ওঠে না। কদাচিৎ উঠলেও মুখটা কুঁচকে যায়: এক ধরনের যন্ত্রণাও বিরক্তি মিশ্রিত ভঙ্গি করে বিদায় নেয়।

বাংলাদেশ থেকে যেসব লেখক এসেছেন, তাঁরাও আজকাল এ প্রসঙ্গ তুলতে চান না। তাঁদের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলতেও ক্লান্ত বোধ করেন। অন্যান্য কথা বলে মনকে ভুলিয়ে রাখা। একটা বিশাল বোঝা সব সময় পিঠের ওপর।

এই রকম অবস্থায় লেখা সত্যিই যায় না। এখন সমস্যাটা যেখানে এসে দাড়িয়েছে সেখানে সাহিত্য সৃষ্টি কিংবা দেশাত্মবোধক গান আর তেমন জোরালো হাতিয়ার নয়।[২৫]

অর্থাৎ প্রকৃত বাংলাদেশ সমস্যা ছিল অনেক জটিল। সাহিত্যিকেরা আবেগ সর্বস্ব সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের তৎকালীন পরিস্থিতিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছিলেন। তাৎক্ষণিক প্রচেষ্টা মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার কয়েক বছর পরেই থেমে যায়। ফলে তেমন আর সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, মনোজ বসু, অমলেন্দু চক্রবর্তী, দেবেশ রায়, বুদ্ধদেব বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত প্রমুখ এই পর্বের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকেরা যাঁদের সাহিত্যকর্মে পূর্ববাংলার বাস্তব সমাজচিত্র, মুক্তিযুদ্ধ বা গণহত্যার ছবি সবচেয়ে ভালভাবে ধরা পড়েছে, তাঁদের জন্মভূমি মূলত পূর্ববাংলা। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩০ সালে ঢাকাতে জন্মেছেন; মনোজ বসুর জন্ম ১৯০১ সালে ডোঙ্গাঘাট, যশোরে; প্রফুল্ল রায়ের

জন্ম ১৯৩৪ সালে ঢাকাতে; অমলেন্দু চক্রবর্তী জন্মেছেন ১৯৩৪ সালে বাঘের গ্রাম, ঢাকাতে; তপোবিজয় ঘোষের জন্ম ১৯৩৬ সালে ময়মনসিংহে; বুদ্ধদেব বসুর জন্ম ১৯০৮ সালে কুমিল্লাতে; নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম ১৯২৪ সালে ফরিদপুরে; দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৭ সালে যশোর জেলায়। জন্মসূত্রে পূর্ববাংলার লেখকেরা পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে বাস করলেও তাঁদের নাড়ির টানের যোগ পূর্ববাংলার সঙ্গেই থেকে গেছে। কয়েকটি উদাহরণ ব্যবহার করলে বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে। অমৃত পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় ১৯৭১ সালে প্রকাশিত অমলেন্দু চক্রবর্তী লিখেছেন 'মুক্তিযুদ্ধ' গল্পটি। হরিহর পণ্ডিত, উদ্বাস্তু কলোনিতে থাকেন। ছেলেদের মৃত্যুর পর, নিজে মজার ছড়া লিখে বাঁধিয়ে ট্রেনে বিক্রি করেন। সেই হরিহর '৭১ সালে নতুন প্রাণশক্তি ফিরে পায়। কারণ সে এখন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখা লেখে। তাঁর এই দ্যাশের প্রতি টান কিন্তু সাধারণ। পশ্চিমবঙ্গের গান ছেড়ে দেশের গান বাঁধায় একজন বলে-

জয় বাংলার নামে এ মত্তকায় দু-চার পয়সা বেশ কাসিয়ে নিচ্ছে বাবা। নাও নাও তোমারই বা দোষ কী?...

কি লিখছেন?

দ্যাশের কথা।

সে তো খবরের কাগজেই থাকে, তাই পড়ব[২৬]

পূর্ববাংলার যুদ্ধ নিয়ে এই আবেগ দেশছাড়া মানুষের মধ্যেই বেশি কাজ করেছে। তপোবিজয় ঘোষের 'গল্পের ভূমিকা' নামক গল্পের শুরুই হয়েছে এভাবে-

এখন কি গল্প লেখার সময়?

ও-পারে মাত্র ক'মাইল দূরে আমার জননী-জন্মভূমির বুকে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। গ্রাম নগর জনপদ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষের মৃতদেহ রাজপথে স্তূপাকার, নদীপথে সারবন্দি ভেসে যাচ্ছে। মাটিতে ট্যাঙ্ক, মেশিনগান, কামানের গর্জন। আকাশে বোমারু বিমানের মারমুখী আনাগোনা। বন্দরের নীল সমুদ্রে যুদ্ধ জাহাজের বব্র বাঁশী। আমার জন্মভূমি আক্রান্ত হয়েছে। তার নরম কোমল শরীর থেকে শতধারায় ক্ষরিত হচ্ছে তপ্ত রক্ত।

এখন কি গল্প লেখার সময়?[২৭]

তপোবিজয় ঘোষ পশ্চিমবঙ্গে বাস করেও পূর্ববাংলাকেই নিজের দেশ ভাবছেন!

১৯৪৭ সাল পরবর্তী সময়পর্ব থেকে দেশ ছেড়ে চলে আসা সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরাও স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর একদা ছেড়ে আসা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ যতটা গভীরভাবে গড়ে উঠবে আশা করেছিলেন ততটা হয়নি। ১৯৪৭ সালের ভারতভাগ এবং পূর্ব-পাকিস্তানের জন্ম যে একটা সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ তৈরি করেছিল, একাত্তর সালে এপার বাংলায় অনেক সাহিত্যিক সেটা মনে করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে সেই সাম্প্রদায়িক আবহ কেটে গিয়ে দুই বঙ্গের মধ্যে অভিন্ন যোগাযোগ তৈরি হবে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। কিন্তু একাত্তর পরবর্তী সময়ে ওপার থেকে চলে আসা মানুষের সেই আশা পূরণ হয়নি। মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর *এত রক্ত কেন?* গ্রন্থে এই বিষয়ে বলছেন-

এই সময় দলে দলে লোক সীমান্তের দিকে ছুটছিল। অনেকের ধারণা হয়েছিল দু দেশ বুঝি একই হয়ে গেছে। কেউ বা ভাবছিল ঝুড়ি ঝুড়ি পদ্মার ইলিশ। সেই সোনার স্বপন, সাধের সাধনা পূর্ণ হয়েছে, রূপসী পূর্ব বাংলার দরজা মুক্ত হয়েছে। যত ওপার থেকে 'জয়বাংলা' ধ্বনি ভেসে আসে তত এপার থেকে মানুষের আবেগ উত্তাল হয়ে ওঠে। সকলের আবেগ যে একই কারণে তা নয়। যারা ওদেশের মানুষ, ওদেশের স্মৃতি যাদের মর্মে মর্মে গাঁথা, দেশের জন্য চোখের জল যাদের আজও শুকায় নি, যারা আতঙ্কিত হয়ে ভিটে ছেড়ে এসেছিল, কলকাতা শহরের ইটের উত্তাপে যাদের শরীরে জ্বালা, প্রিয়ার আলিঙ্গনের চেয়েও মধুর নারিকেলের বাগানের বাতাসের জন্য যাদের শরীর ব্যাকুল, তাদের কাছে বাংলা দেশের দরজা খোলার অর্থ অনেক বেশী ব্যক্তিগত।[২৮]

ভারতভাগের কিছু পূর্ব থেকে এবং মূলত ভারতভাগ পরবর্তী সময়ে। বহু সংখ্যক হিন্দু ওপার বাংলা থেকে এপারে চলে এসেছিলেন। ভারতভাগের পর পূর্ববঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হয়ে পরে। অনেকক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক অশান্তি শিকার হয়ে বা মানসিক প্রশান্তির কারণে অনেকে পাকাপাকিভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন। দেশভাগ পূর্বেও বহু মানুষ কলকাতায় এসেছেন শিক্ষাগ্রহণ ও কর্মসূত্রে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা শহর ও তার আশেপাশের কলেজগুলিতে ছাত্রবস্থা কাটিয়েছন। শেখ মুজিবুর রহমান নিজে কলকাতা শহরে ছাত্রজীবন কাটিয়েছন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ওপারের

সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশের মনে হয়েছে জীবনে উন্নতির পথে কলকাতা বা শহরতলী অনেকাংশে বেশি সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। ভারতভাগের পরে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধর্মীয় মেরুকরণের সৃষ্টি হয়েছিল, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পর্বে, সেই মেরুকরণের স্তর ভেদ করে বাঙালি সত্তার জাগরণ হবে বলে অনেকে ধারণা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের একটি অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি এপার বাংলায় গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার পর পূর্ববাংলায় সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা মাথা তুলেছিল। ১৯৭৬ সালের নভেম্বরে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদের অপসারণ করেন। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্ম বৈষম্য ও ধর্মের অপব্যবহারের বিলোপ সাধন করে ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবায়নর পথ সুগম করার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ১৯৭৭ সালের মে মাসে, সংবিধানের ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করা হয়। এর ফলে, ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন করার পথ সুগম হয়। সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদের সাথে একটি নতুন উপ-অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়। যেখানে ইসলামি সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হয়। পরে ১৯৮৮ সালের জুন মাসে এরশাদের শাসনামলে 'ইসলাম'কে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়।[২৯] বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকেই ওপার বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের দেশ ছাড়া প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছ। একাত্তর সালে এপারের যে বাঙালিরা ভেবেছিলেন দুই বাংলা এক হয়ে যাবে, সেই স্বপ্ন পূরণ সম্ভব হয়নি। এর ফলে এপার বাংলার বাঙালিদের মধ্যে একাত্তর সালে পূর্ববাংলা সম্পর্কে যে আবেগ তৈরি হয়েছিল তা অনেক ক্ষেত্রে স্তিমিত হয়ে পড়েছে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা নিয়ে চর্চার পরিসর কমে গেছে।

### ১.২ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

১৯৭২ সালের প্রথম পর্ব থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। একাত্তর সালের শেষলগ্ন থেকে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ভারতের পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার পর থেকেই পূর্ববঙ্গ থেকে আসা শরণার্থীরা নিজেদের দেশে ফিরতে থাকে। ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় প্রকাশিত একটি 'সপ্তাহ কালের মধ্যেই শরণার্থীদের ফেরৎ পাঠানো শুরু হচ্ছে' শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন—

এই লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে তাদের স্বদেশে ফিরিয়ে

দেওয়ার দায়িত্বের ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি ভারত সরকার দিয়েছিলেন আজ তা পূর্ণ হতে চলেছে।[৩০]

অসমের *সাপ্তাহিক পূর্ব্বায়ন* পত্রিকার ১৯৭২ সালের ৫ জানুয়ারিতে প্রকাশিত প্রতিবেদনেও শরণার্থীদের নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীহট্ট শহরের গিরিশরাজা স্কুলে ভারত থেকে প্রত্যাগত শরণার্থীদের জন্য অস্থায়ী ট্রানজিট ক্যাম্প স্থাপন হয়েছিল। শরণার্থীদের উক্ত ক্যাম্পটির মাধ্যমেই নিজ নিজ এলাকা ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।[৩১] বাংলাদেশের স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া ও শরণার্থীদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থাসমূহের সমান্তরাল সময়কালে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমাগত অস্থির হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। সমাজের সর্বস্তরে এক অবক্ষয়িত যুগের প্রতিধ্বনির দামামা বেজে উঠেছিল। ১৯৬৭ সালের ২৫ মে তারিখে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি গ্রামে কৃষকদের কর্তৃত্ব ভূস্বামীদের উৎখাত করার মাধ্যমে নকশাল আন্দোলনের সূচনা হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র একাংশ ১৯৬৯ সালের ১ মে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেলিনবাদী) নামে একটি পৃথক বামপন্থী দল গঠন করেন। এই বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে ছিলেন চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধুরী, কানু সান্যাল ও জঙ্গল সাঁওতাল। ১৯৬৯-এর ১ মে কলকাতা ময়দানে এক জনসভায় কানু সান্যাল কর্তৃক সিপিআই (এমএল) গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। চারু মজুমদার এই দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৯-৭১ সাল এই নবগঠিত দলটি সবচেয়ে পরাক্রান্ত এবং মারমুখী বিপ্লবী দলরূপে বিদ্যমান ছিল।[৩২]

স্বনামধন্য অধ্যাপক ও গবেষক অরূপকুমার দাস তাঁর *৬০ সত্তরের দিনপঞ্জি* গ্রন্থে ১৯৬০-১৯৮০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ঘটে চলা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাগুলির সংকলন করেছেন। একাত্তর পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাবলির বিশেষণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে ঘটে চলা অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনুধাবন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। ১৯৭২ সালের ১১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বরানগরে জ্যোতি বসু, সিপিআই প্রার্থী শিবপদ ভট্টাচার্যের কাছে পরাজিত হন। অন্যান্য বিধানসভা আসনগুলিতেও সিপিএম প্রার্থীরা পরাজিত হন। কংগ্রেসের সহযোগী শরিকদল হিসাবে সিপিআই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৭১-এর নির্বাচনের ফলাফলের থেকে ১৯৭২-এর নির্বাচনে কংগ্রেস ও সিপিআই-এর আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে সিপিআই (এম) এবং বাংলা কংগ্রেসের

সমর্থনে অজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। মাত্র ৮৩ দিনের মাথায় শরিকি মনোমালিন্যে নিজ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ধরনা ও অনশনে বসার কারণে তাঁর সরকার পড়ে যায়। এরপর তিনি পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ১৯৭২ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। অজয় মুখার্জীর বাংলা কংগ্রেসের অবলুপ্তি ঘটে। ইন্দিরা গান্ধির হাত ধরে ব্যাপকভাবে প্রাচীন নুোদের তুলনায় নবীন কংগ্রেস নুোদের সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯৭২-এর সালের নির্বাচনে ব্যাপক অরাজকতা তৈরি হয়। সিপিআই (এম) উক্ত নির্বাচনটিকে প্রহসন বলে আখ্যায়িত করেন।[৩৩] ১৩ মার্চ ১৯৭২ সালে *যুগান্তর* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রথম পাতার খবরের শিরোনাম ছিল 'শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ, দু'জন তরুণ নিহত: নানা স্থানে কার্ফু'।[৩৪] নির্বাচন পরবর্তী অস্থিরতার একটি আভাস উক্ত শিরোনামটি থেকে বোঝা যেতে পারে। আজিজুল হক *প্রতিদিন* পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাহাত্তরের আগে কিন্তু উনসত্তর-সত্তর-একাত্তর' শিরোনামাঙ্কিত লেখায় মন্তব্য করেছিলেন–

মোড়ে মোড়ে মহাতালগুড় সংঘের ঠেকে প্রকাশ্যে মদ্যপানের আসর। সিনেমার রাত্রি-প্রদর্শনী বন্ধ। মুখ্যমন্ত্রী স্পোর্টস গেঞ্জি পরে রেসের মাঠে বাজি লড়ছে! রক্তাক্ত বাংলাদেশ। বাংলা চলে গেল গো-বলয়ের ভোগে। যে যে বাড়িটা পারল দখল করে নিল। কেউ করল নার্সিংহোমের ব্যবসা, কেউ বানালো মদ্যপানের দোকান। কেউ কেউ নিল মিনিবাস। আমেরিকার ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের মত আইনিভাবেই সরকারি কোষাগার থেকে পাড়ায় পাড়ায় শত্রু নিকেষের জন্য ক্লাব গড়ে উঠল। খুন নেমে এল সর্বত্র। এই প্রথমে বাংলাতে পেশাদার খুনি তৈরি হল... এই অবস্থাতে '৭২ সালের নির্বাচন। এই অবস্থাটা তৈরি করেই সিদ্ধার্থ নির্বাচন লড়তে চায়।[৩৫]

২০ মার্চ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সন্ত্রাস বন্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা দেওয়া হলেও বাস্তবে সেই ঘোষণা কার্যকর হয়নি। বিরোধীরা ভোট লুটের অভিযোগে বিধানসভা বয়কট করেছিলেন। ২১ মার্চ ১৯৭২ সালে প্রকাশিত *যুগান্তর* পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধির 'পশ্চিমবঙ্গের বিরোধীদের বিধানসভা বয়কট করা উচিত নয়' উক্তি সম্বলিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৬] বিরোধীদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমাগত দানা বেঁধে উঠেছিল। ১৯৭৩ সালের ৩ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের আট-পার্টির বৈঠকে জনজীবনের ক্রমবর্ধমান সমস্যা মোকাবিলায় সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৩ সালেই দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস কর্মী-সম্মেলনে মুহুর্মুহু প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর নামে জয়ধ্বনি ওঠায়

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ক্রুদ্ধ হন। সিদ্ধার্থ-প্রিয় সম্পর্কের অবনতির জল্পনা ওঠে। এই বছরই ১ অক্টোবর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নকশালপন্থীদের সঙ্গে কারারক্ষী ও পুলিশের সংঘর্ষে ১৪ জন আহত হন। ১৯৭৪ সালে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রীসভার পুনর্গঠন হয়। রাজ্যের শহরাঞ্চলগুলিতে ছাত্র ও যুব কংগ্রেসের সশস্ত্র গোষ্ঠীসংঘর্ষ চলতেই থেকেছে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন গভীর রাতে সূচনা হয় ভারতীয় গণতন্ত্রের কালো দিন। দিলিতে বিরোধী নেতাদের গ্রেফতার করা হয়, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। অকস্মাৎ জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত একটি তথ্য থেকে অস্থির সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। ১৯৭৫ থেকে জুন ১৯৭৬ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি ক্ষেত্রে ৮৮টা ধর্মঘট ১২৭টা লক-আউট হয়েছিল। ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধি পরাজিত হন। জরুরি অবস্থার সময়ে তাঁর সরকারের কর্তৃত্ববাদী নীতি ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে যে অসন্তোষ ছিল, এই পরাজয় তার মূল কারণ। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৭৭ সালের ১ মার্চ ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি. স্বামী নাথনের সঙ্গে দেখা করে বামপন্থী নেতারা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সুনিশ্চিত করার দাবি জানান। ১৯৭৭ সালে ১১ জুন পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার নির্বাচন হয় ১৪ জুন দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ হয়। ১৫ জুন নির্বাচনী ফলপ্রকাশের সূচনায় স্পষ্ট হয়, বামপন্থী ফ্রন্ট ২৯৩ আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনে বিজয়ী হয়েছে।[৩৭] পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহে ১৯৭৭ সালের পর থেকে স্থিতিশীলতা আসতে থাকে। কিন্তু ততদিনে স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মানসজগতে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার সার্বিক রূপদানের যে চেষ্টা একাত্তর সালে এপারের বাঙালি সাহিত্যিকরা করেছিলেন, সেই ধারা ততদিনে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

১৯৯৬ সালের ১৩ এপ্রিল *গণশক্তি* পত্রিকাতে অধৃষ্য কুমারের 'সত্তর-এর সিদ্ধার্থ সন্ত্রাস ফিরে দেখা' শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশ পেয়েছিল। ২৮ মার্চ ১৯৭২ সালে দিলিতে সাংবাদিক রঞ্জিত রায়ের সঙ্গে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের একটি কথোপকথনের একটি অংশ প্রাবন্ধিক তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। সাংবাদিক রঞ্জিত রায়ের গত এক বছরে ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডগুলির তদন্ত হবে কিনা প্রশ্নের উত্তরে রায় জানিয়েছিলেন, নুন করে কোনও তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না। কারণ খুনিকে তাঁরা জানেন। সাধারণ মানুষ প্রকৃত অপরাধী কারা জানতে চান এই প্রশ্নের উত্তরে রায় বলেছিলেন,

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এ বিষয়ে এত জানতে চায় না। কেবল সিপিএম এটার জন্য দাবি করেছে।[৩৮] সমাজের, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অরাজকতার দিকগুলিকে সাহিত্য সমকালের পরিচয় হিসাবে ধরে রাখে। ১৯৭১ সাল পরবর্তী কয়েকটি বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্রকে ছোটগল্পকাররা তাঁদের ছোটগল্পে স্মরণীয় করে রেখেছেন। গল্পগুলি হয়ে উঠেছে অস্থির সময়ের দলিল।

১৯৭১ সালের কলকাতা শহরের বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছিল কল্যাণ সেনের 'কলকাতা একাত্তর' গল্পটি। গল্পে একাত্তর সালের রাজনৈতিক অস্থিরতার ছবি স্পষ্ট। মুক্তিযুদ্ধের কলকাতার আবহে এই গল্পের প্রেক্ষিত ভিন্ন। দক্ষিণ কলকাতার একটি ছেলে উত্তর কলকাতার একটি অভিজাত বাড়িত টিউশনির খোঁজ করতে এসে জানতে পারে, অজ্ঞাত খুনিদের হাতে কিশোর ছেলেটি মারা গেছে। এক অদ্ভুত শূন্যতার দ্বারা আবেগের বশবর্তী হয়েই যুবকটি, সেই স্থানে এসে পৌঁছায় যেখানে তরুণ নামক কিশোরটিকে অজানা খুনিরা খুন করেছে। কথক যেন নিজের কল্পনায় তরুণকে জীবন্ত করে। জেনে নিতে চান ছেলেটির খুন হওয়ার কারণ। একাত্তরের অরাজকতার পরিস্থিতি এখানেই বীভৎস রূপ নেয় যখন তরুণের খুনিরা যুবকটিকে 'খোচর' মনে করে মেরে ফেলে। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিমণ্ডল থেকে আসা দু'জন মানুষ খুন হয়। খুনিরা একই থেকে যায়। গল্পটিতে চরিত্রগুলির রাজনৈতিক পরিচয় স্পষ্টভাবে ধরা না পড়লেও বোঝা যায়, বিরোধী দলের প্রতিনিধি ভেবে তরুণ নামক কিশোরটি খুন হয়েছে। অন্যদিকে কথকের খুন হওয়ার মধ্যে দিয়ে অরাজনৈতিক সমাজে বেঁচে থাকার মানে ক্ষীণ হয়ে পড়ে।[৩৯]

কৃষ্ণ চক্রবর্তী তাঁর রচিত 'পশ্চিমবঙ্গ ১৯৭৩'-এ তুলে ধরেছেন ১৯৭২-৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে ঘটে চলা অশান্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ছবি। ১৯৭২ সালের পর ক্ষমতায় আসা শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের বয়ান এই ছবি। ক্ষমতা যেখানে হস্তক্ষেপ করেছে পিতা ও পুত্রের সম্পর্কের মধ্যেও। বৃদ্ধ মিস্ত্রি যামিনী তাঁর নিজের ছেলেকে ঘৃণা করে। কারণ সে জানে কেবলমাত্র 'মার্কসবাদী' পার্টি করার অপবাদে তার ছেলে একটি নিরপরাধ ছেলেকে খুন করেছে। কিন্তু পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেনি। তার ছেলে হারু, সরকারে থাকা দলের কর্মী। অন্য দলের ছেলে খুন হলে পুলিশ কিছু বলে না। যামিনী চায় তার ছেলে শাস্তি পাক। চরম অরাজকতার পরিবেশে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে ছেলেটি আবারও খুন করে এবং পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সরকারি দলের কর্মীরা জোর করে বিরোধীদের ডাকা হরতাল বাতিল করে দেওয়ার চেষ্টা

করে। কিন্তু যামিনীর মতো আরও কিছু খেটে খাওয়া মানুষ সংঘবদ্ধভাবে রুখে দেয় সেই প্রচেষ্টা। খেটে খাওয়া প্রতিটি মানুষকে অন্ধকারচ্ছন্ন সময়ে টিকে থাকার লড়াই করতে হয়েছে।[৪০]

১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের শেষে ১৬ ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশ নামক স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির জনপ্রিয়তা এই যুদ্ধে জয়লাভের পর ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৭১ সালে সর্বভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত কার্টুনগুলিতে ইন্দিরা গান্ধিকে দেবী দুর্গা রূপে চিত্রায়িত করা হয়েছিল। ৩ জুলাই, ১৯৭২ সালে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে সিমলাতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৪১] ইন্দিরা গান্ধির এই বিপুল জনপ্রিয়তা প্রশ্নের মুখে পড়তে বাধ্য হয় ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন জরুরি অবস্থা ঘোষনা করার ফলে।

১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে করা একটি মামলায়, তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হন। এবং ৬ বছরের জন্য তাঁকে পার্লামেন্টরি রাজনীতি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে ইন্দিরা গান্ধি দেশের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। *যুগান্তর* পত্রিকার ২৭ জুন ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিলড় 'বিরোধীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করতেই জরুরি ব্যবস্থা নিতে হলে ।। ইন্দিরা' প্রতিবেদনটিতে আরও লেখা হয়, এক বেতার ভাষণে ইন্দিরা গান্ধি জানিয়েছিলেন দেশ ও জাতির ঐক্য ও স্থায়িত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই সরকারকে জরুরি অবস্থার মতো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে।[৪২] জরুরি অবস্থার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাঙালিদের জীবনে এক গভীর প্রভাব পড়েছিল। প্রচুর সংখ্যক বিরোধী নেতা কর্মীদের 'মিসা' অর্ডিন্যান্স নামক আইনের আওতায় এনে, বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখা হতে থাকে।

জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার ফলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সৃষ্টি সাহিত্যকর্মের উপরেও নানা ধরনের বাধানিষেধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের পর থেকে দু'বছর ধরে চলতে থাকা জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে নাট্যকার অমল রায়ের উপর গুন্ডারা আক্রমণ করে। ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছিল। ১৯৭৬ সালে নৈহাটিতে মুকুন্দ দাস যাত্রাসমাজ শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের পালারূপ অভিনয় করতে গেছে, তাঁদের উপর আক্রমণ চালানো হয়। এছাড়া তারকেশ্বরে 'হে রাজবিদ্রোহী', হাওড়ার শিবপুরে 'দিন আসবেই',

বসিরহাটে 'লাসবিপনি', শ্রীরামপুরে 'রক্তের জোয়ারে শুনি' প্রভৃতি নাটকগুলির মঞ্চস্থ হয়েছিল, কিন্তু শাসক-সমর্থক গুন্ডাদের দ্বারা নাটকগুলির স্বর প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। শুধু সংবাদপত্র ও নাটক নয়; গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধসহ সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাগুলির উপরও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়। মূলত শঙ্খ ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, গৌরকিশোর ঘোষ, শম্ভু রক্ষিতের কবিতা, সমর সেনের গদ্য, কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস এবং উদয় রায়ের গল্পের পাশাপাশি নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানকেও সেন্সরের আওতায় আনা হয়। জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী যুব কংগ্রেসের আয়োজিত দিলির সংগীত সন্ধ্যায় অংশগ্রহণ করেননি বলে, রেডিওতে তাঁর গান চালানোর উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রোগ্রাম বাতিল করা হয়।[৪৩]

১৯৭৫ সালের ২৭ জুন *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ সম্পাদকীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সংকীর্ণ ও গোঁড়া মনোভাবের দ্বারা আবদ্ধ না থেকে জ্ঞান অর্জনের পূর্ণতা লাভ করা এই কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু। ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তি আত্মজাগরণকেন্দ্রিক রচনাগুলিকেও ইন্দিরা চালিত শাসনুন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ব্যবহৃত হতে পারে বলে মনে করা হয়েছিল। ভারত সরকারের মুখ্য তথ্য অফিসারের নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। শুধু গান নয়, জরুরি অবস্থার সময় অনেক রবীন্দ্রসংগীতও নিষিদ্ধ হয়েছিল।[৪৪] ঔপন্যাসিক চাণক্য সেন রচিত *ব্রুটাস তুমিও!!* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। উপন্যাসটির কাহিনিতে জরুরি অবস্থার সময় পর্বের কাহিনি স্থান পেয়েছে। উপন্যাসটিতে 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির' কবিতাটি নিষিদ্ধ হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ২৫টি গানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।[৪৫]

সারা ভারত জুড়ে চলা জরুরি অবস্থার বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের গল্পকারদের কলমে। সারা দেশ জুড়ে চলছিল এক দমবন্ধ করা অবস্থা, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করেছিল অনিশ্চয়তা। অমল চক্রবর্তীর 'অনুশাসনীয়' গল্পে উঠে এসেছে জরুরি অবস্থার সময় চলা এমনই এক ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থার ছবি। স্কুল মাস্টার কান্তি যেখানে জরুরি অবস্থার সময়কে অসম্মান করার মিথ্যে অভিযোগ ক্লাসে বসা ছাত্রের কাছে অপমানিত হয়েছে। তৎকালীন ক্ষমতাধর পার্টির সদস্যদের কাছে নিগৃহীত। 'অনুশাসন' নামক

রাজদণ্ডের অত্যাচারে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক কলঙ্কিত হয়েছে।[৪৬]

তপোবিজয় ঘোষের 'মুক্তি চাই' গল্পের কাহিনির প্রধান চরিত্র একজন স্কুল শিক্ষিকা মায়ের। যার ছেলে রাজনৈতিক অপরাধী হিসাবে জেলে বন্দি। মধ্যবিত্ত শিক্ষিকা এবং নিম্নবিত্ত স্কুলের কেরানি জীবন যুদ্ধের সংগ্রাম গল্পে এক হয়ে গেছে। যখন জানা যায় স্কুলের কেরানির ছেলেও কোন এক জেলে বন্দি। রাজবন্দিদের মুক্তির কথা লেখা একটি আবেদনপত্রের সই করার দৃশ্যকল্পের মাধ্যমে গল্পটি শেষ হয়েছে। গল্পে বর্ণিত পটভূমি থেকে বোঝা যায় বর্ণিত কালে জরুরি অবস্থার অবসান ঘটতে চলেছে।[৪৭]

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে। শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষমতা ভার নিজের হাতে তুলে নেন। এপারের বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের যে আবেগকে প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করেছিল ১৯৭২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত চলা রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতি ও প্রতিনিয়ত অবক্ষয়িত সামাজিক মূল্যবোধের মাঝে মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার আবেগে ভেসে, সমপরিমাণ সাহিত্য রচনা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পশ্চিম-পাকিস্তানিদের বাঙালিদের উপর চালানো যে গণহত্যার কাহিনি এপারের সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন নকশাল আন্দোলনের সময়পর্বে এপার বাংলায় সেই ছবি ফিরে এসেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচনা করেছিলেন 'পলাতক ও অনুসরণকারী' গল্পটি। ক্রমাগত অনুসরণকারীদের দ্বারা আতঙ্কে থাকা যুবকটি, পিছু নেওয়া ছেলেদের হাতে খুন হয়। আবার অনুসরণকারী ছেলেদের পিছু নেয় অন্য একটি দল। বিনা অপরাধে 'খুন' হয়ে যাওয়ার ভয় হয়ে উঠেছিল একাত্তর পরবর্তী কালের এক বাস্তব সত্য।[৪৮] ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থাকালীন সময় সংকটের সেই পরিস্থিতিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধকালীন রচিত বেশ কিছু সাহিত্যকর্মের খোঁজ অসম থেকে পাওয়া গিয়েছিল। অসমের বাঙালি সাহিত্যিকরা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কলম ধরেছিলেন। কিন্তু ১৯৭২ সালের শুরু থেকে অসমের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলে যেতে শুরু করে। অসমে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়। আসাম বাঙালি ও সংখ্যালঘু ভাষাভাষী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে অসমে বাঙালি ও সংখ্যালঘু বাংলাভাষীদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ বিভিন্ন জনসভার আয়োজন করা হয়। চৌধুরী শহীদ কাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত অভিসন্দর্ভের অসম অংশে লিখেছিলেন, তিনি বরাক উপত্যকার মাঠ

পর্যায়ের গবেষণায় একাত্তর সালে যাঁদের সাক্ষাৎকারে নিয়েছিলেন, তাঁদের সুস্পষ্ট দাবি ছিল বরাকের স্থানীয় মুসলমানদের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে কোনও ধরনের সম্পৃক্ততা ছিল না। বরাকের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক অতীন দাস, নীতিশ ভট্টাচার্য, নীতিশরঞ্জন দে সহ অনেকেই তাঁকে জানিয়েছেন স্থানীয় মুসলমানর বরাকে একাত্তর সালে অস্থিরতা সৃষ্টিতে ইন্ধন দিয়েছে। যদিও এই অভিযোগ সর্বতোভাবে সঠিক নয়। ফলে চৌধুরী শহীদ কাদের মন্তব্য করেছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময়পর্বেই স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পক্ষে ও বিপক্ষে দুই ধরনের মতামতই প্রকট হয়ে উঠেছিল।[৪৯] একাত্তর সাল পরবর্তী সময়ে আসামের বাঙালিদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করতে হয়েছে। সেখানে বাংলা ভাষা ও অসমীয়া ভাষার বিরোধ ছিল স্পষ্ট। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধ চর্চার যে ধারা অসমের বরাক উপত্যকায় শুরু হয়েছিল একাত্তর পরবর্তী সালে সেই ধারা পূর্বের মতো সচল ছিল না।

১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময়পর্বে, বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান ও ১০ জানুয়ারি ঢাকা পৌঁছান। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে ঘোষিত স্বাধীনুার সনদের উপর ভিত্তি করে শাসনভার গ্রহণ করেন। ভারতের বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল এক ধরনের আবেগ। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দুই বাংলার বাঙালির হৃদয়ে নাড়া দিয়েছিল। বিশেষত বাঙালি সত্তার জাগরণ ঘটেছিল বঙ্গবন্ধু চরিত্রের মাধ্যমে। এপারের সাহিত্যিকদের কলমে বঙ্গবন্ধু চরিত্র তাঁর আদর্শকে কেন্দ্রে রেখে সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে। নির্মল গুপ্তের *বাংলা আমার বাংলা* উপন্যাস, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'উদয়তারা' গল্প, মন্মথ রায়ের 'স্বাধীনতার ইতিহাস' ও 'আমি মুজিব নই'-এর মতো নাটকে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান চরিত্রের উল্লেখ হয়েছে। অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত 'বঙ্গবন্ধু' কবিতাটি। বনফুল লিখেছেন 'সহস্র সেলাম' কবিতাটি। *অমৃত* পত্রিকার 'দেশে বিদেশে' অংশ শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের নায়কের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।[৫০] অর্থাৎ একাত্তর সাল জুড়ে দু-পারের বাঙালির কাছেই মুজিবুর রহমান থেকেছেন আগ্রহের কেন্দ্রে। নয় মাসব্যাপী যুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকালীন খাদ্যশস্য উৎপাদন বিঘ্নিত হয়েছিল। ফলে নতুন দেশটিতে খাদ্য সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। সরকারি ও বেসরকারি ভবনগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। প্রচুর মানুষ গৃহহীন হয়ে

পড়েছিল, ফলে শরণার্থী পুনর্বাসনের প্রয়োজন ছিল। শহিদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশটির উপর ক্রমাগত চাপ বাড়ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে যে প্রত্যাশা মুজিবুর রহমানকে নিয়ে তৈরি হয়েছে, সেই প্রত্যাশাকে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেনি। ১৯৭২ সালে জাতীয় রক্ষী-বাহিনী গঠন করা হয়। বাহিনীটি ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের অনুগত। রক্ষী-বাহিনীর হাতে যে-কোনও ব্যক্তিকে গ্রেফতার, কোনও স্থান ও যানবাহন তল্লাশি করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। ফলে সেনাবাহিনী ও রক্ষী-বাহিনীর মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছিল।[৫১] ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের ফলে মানুষ মারা যায়। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ১৯৭৪ সালের ১৭ এপ্রিল *গণকণ্ঠ* সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'অনাহারে বিভিন্ন স্থানে ৫৬ জনের মৃত্যু'। পত্রিকায় আরও লেখা হয়েছিল ৭টি জেলায় ভয়াবহ খাদ্য সংকট তৈরি হয়েছে। একমুঠো ভাতের আশায় বুভুক্ষ জনতা শহরে ভিড় জমাচ্ছে।[৫২] এখানে উল্লেখ্য, *গণকণ্ঠ* ছিল প্রচণ্ডরকম মুজিব বিরোধী। বাকশাল গঠনের ফলেও এপার বাংলায় মুজিবের জনপ্রিয়তা প্রবলভাবে ধাক্কা খেয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা মুজিবুর রহমান দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা তৈরি করার প্রয়াস করেন। আওয়ামী লিগ-সহ সকল রাজনৈতিক দলগুলিকে বিলুপ্ত করা হয়। বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লিগ বা বাকশাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বলে বহুদলীয় সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন করে একদলীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লিগের সমর্থকেরা ব্যাপক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়লে শেখ মুজিবুর রহমান জরুরি অবস্থা জারি করেন। কিছু সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করে দেওয়া, রাজনৈতিকভাবে বিরোধীদের প্রচুর পরিমাণে ধরপাকড় করা হয় এই সময়পর্বে।[৫৩]

আহমেদ ছফা তাঁর 'মুজিব শাসন: একজন লেখকের অনুভব' লেখায় লিখেছিলেন শেখ মুজিবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনটা ছিল কৌশলগত দিক থেকে তাঁর নতুন শাসনতান্ত্রিক বিধি চালু করার পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক

পদক্ষেপ। ১৯৭৫ সালের শুরুর দিকে মুজিব বিরোধীদের বেশ কিছু সংখ্যককে জেলে ভরা হয়েছিল। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তরুণ বয়স্ক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের খুশি মতো হত্যা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর স্থানে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি হয়ে বসেছেন তিনি। নিজের দেখা একটি অভিজ্ঞতার কথাও আহমদ ছফা উক্ত লেখাতে তুলে ধরেছেন–

"রাতের আঁধারে শক্ত হাতে আলকাতরা দিয়ে দাবড়া করে লেখা শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারকে চ্যালেঞ্জ করা দেয়াল লিখনসমূহ নবীন চুনের প্রলেপের তলায় ঢাকা পড়েছে। সুন্দরীর ললাটে সিন্দুর বিন্দুর মত বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সুইচ্চ শুভ্র প্রাচীরের কপোলদেশে শিল্পীর নিপুন তুলিতে লেখা সুন্দর লিখন মালা দৃষ্টিকে দূর থেকে টেনে নিয়ে যায়। শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতির ত্রাণকর্তা, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের মহানায়ক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লৌহমানব" ইত্যাদি।[৫৪]

অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে তাঁর নানা সিদ্ধান্তের জন্য সমালোচিত হচ্ছিলেন। ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালের *যুগান্তর* পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানি রাজনৈতিক পদ্ধতির বদলের সমালোচনা করে প্রতিবাদ স্বরূপ পদত্যাগ করেছিলেন।[৫৫]

এপারের পত্র-পত্রিকাগুলিতে মুজিবুর রহমানের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে সমালোচনা হয়েছিল। 'অন্নদাশঙ্কর রায়ের মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক লেখায় মুনতাসীর মামুন লিখেছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায় তিনবার ঢাকা গিয়েছিলেন ১৯৭১ সালের পর। দু'বার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন, একবার করেননি। মনোজ বসু সেবার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ভারতে বিভিন্ন পত্রিকায় তখন বাকশাল নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে, বিরূপ সমালোচনা হচ্ছে। মনোজ বসু অন্নদাশঙ্করকে বলেছিলেন, কথা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু তাঁকে বলেছিলেন–

"ইন্ডিয়ানরা কেন আমার পেছনে লেগেছে? ওরা কি আমাকে বাঁচতে দেবে না? আমাকে সময় দিক দেখুক আমি কী করি। এই আমার শেষ চান্স। এবার যদি আমি ব্যর্থ হই তো আত্মহত্যা করব"।[৫৬]

শেখ মুজিবুর রহমানকে আত্মহত্যা করতে হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল সদস্য সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর নিজ গৃহ পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যের সঙ্গে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে *যুগান্তর* পত্রিকায় ১৯৭৫ সালের ১৭ আগস্ট শিরোনাম লেখা

হয়েছিল 'বাঙলাদেশে অভ্যুত্থান: মুজিব ও মনসুর আলি নিহত'।[৫৭] ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবুর রহমান এপারের বাঙালির কাছে হয়ে উঠেছিলেন আবেগের অন্য একটি নাম। স্বাভাবিকভাবে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর সেই আবেগে ভাটা পড়ে এবং এপারে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে সংগঠিত গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ চর্চার ধারা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

## ১.৩ উপসংহার

বাংলাদেশ সম্পর্কিত চর্চার ধারায় একাত্তর-পরবর্তী সময়কালে একমুখীনতা ও চর্চার সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ ভারতবর্ষের বাঙালি সমাজ তথা সারা পৃথিবীতে অবস্থানরত বাঙালি জনসমাজে এক বিশাল প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৭১ সালে এপারের বাঙালির একাংশ আবেগপ্লুত হয়ে মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনা করেছেন। তাই তৎকালীন সাহিত্যে, সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলির খবরের একটি বড় অংশ জুড়ে থেকেছে মুক্তিযুদ্ধের খবর। সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলি সাধারণত সমাজের বহমান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মাধ্যমেই খবর সংগ্রহ করে। সেক্ষেত্রে সামাজিক স্তরে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব কতটা গভীরে পৌঁছেছিল তা অনুধাবন করা যায়। একাত্তর-পরবর্তী পর্যায়ে সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলিতেও বাংলাদেশের খবর পরিবেশনের সংখ্যা কমতে থাকে। '৪৭ পরবর্তী সময়ে দেশত্যাগ করে আসা মানুষদের যে অংশ স্বপ্ন দেখেছিল, স্বাধীন বাঙালি রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' গঠন হলে তারা পুনরায় ছেড়ে আসা দেশে ফিরে যেতে পারবে, তারাও সবক্ষেত্রে নবগঠিত দেশে ফিরে যেতে পারেনি। এই শরণার্থীদের চাপের প্রভাব সামাজিক জীবনে বিরূপতা তৈরি হয়েছিল। সাতচল্লিশ সাল পরবর্তী সময়পর্ব থেকে চলে আসা সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবিরাও স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর ছেড়ে আসা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ যতটা গভীরভাবে গড়ে উঠবে আশ করেছিলেন ততটা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বাহাত্তর সালের পর থেকে আরও বেশি জটিল হয়ে পড়ে। বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীরা অনেকে নিজেদের সাময়িকভাবে সাহিত্যের জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। একাত্তর-পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থা মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা বিষয়ক সাহিত্য রচনার ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। রাজনৈতিক কারণ উক্ত ধারার সাহিত্যচর্চাকে ব্যাহত করেছে।

### তথ্যসূত্র

১. মৈত্রেয়ী দেবী, *এত রক্ত কেন?* কলকাতা, নাথ ব্রাদার্স, প্রকাশকাল- ১৯৮৫, পৃ- ০৬
২. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৮ বর্ষ, শনিবার, ১২ চৈত্র, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ- ০১

৩. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ- ০১
৪. *যুগান্তর*, ১৩ বর্ষ, ১৮৭শ সংখ্যা, ১২ চৈত্র, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ- ০১
৫. মৈত্রেয়ী দেবী, *মহানিষ্ক্রমণ*, মৃদুল হক (অনুবাদ), কলকাতা, মান্দাস, প্রকাশকাল- ২০২৫, পৃ- ৯-১০
৬. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৫০ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, সোমবার, ১৫ চৈত্র, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।
৭. তুষারকান্তি ঘোষ (সম্পা), *অমৃত বাংলাদেশ বিশেষ সংখ্যা*, ১১শ বর্ষ, শুক্রবার, ২৩শে বৈশাখ, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৬-৭
৮. দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল (সম্পাঃ), *পরিচয়*, *বাংলাদেশ সংখ্যা*, সংখ্যা ৮-৯, বর্ষ ৩৯, ১৩৭৭-৭৮, পৃ- ৭২৩
৯. মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধঃ একাত্তরের সাহিত্য ও পশ্চিমবঙ্গ*, বাংলাদেশ মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০২১, পৃ- ১৭-১২০
১০. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, শনিবার, ২৮ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, পৃ- ১৪
১১. অমিতাভ ভট্টশালী, *'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কেন পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য সিনেমায় উপেক্ষিত'*, আন্তর্জালিক সূত্র- https://www.bbc.com/bengali/news-38343195, Date- 07.08.25, Time- 10.00 P.M
১২. আশীষ কুমার দাস, অমিয় কুমার বাউল (সম্পা), *অনুসন্ধানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০২২, পৃ- ৫-৬
১৩. ইসমাইল সাদী (বিশেষ সংখ্যা সম্পা), *মুখাবয়ব বঙ্গবন্ধু ১০০*, আগরতলা, শ্রাবণ-পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, পৃ- ১৩-১৪
১৪. অধীর বিশ্বাস (সম্পাঃ), *আজকের গাঙচিল পত্রিকা*'র *মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক সংখ্যা*, কলকাতা, প্রকাশ- ২০২২, পৃ- ৩-৬
১৫. শিবপ্রসাদ সমাদ্দার, *বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানি*, আবর্ত বাংলাদেশ বিশেষ সংখ্যা, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী (সম্পাঃ), ১৯৯৬, পৃ- ৩
১৬. শিবনারায়ণ রায় (সম্পাঃ), *জিজ্ঞাসা বাংলাদেশ বিষয়ক সংখ্যা*, ত্রয়োদশ বর্ষ, মাঘ-চৈত্র, ১৩৯৯, পৃ- ০১
১৭. শুভ রহমান, *সাংবাদিকের চোখে মুক্তিযুদ্ধ*, উত্তরধ্বনি বাংলাদেশ সংখ্যা, বীরেন চন্দ্র (সম্পাঃ), ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, (সূচিপত্র) পৃ- ০২
১৮. রবিউল করিম, এন জুলফিকার (সম্পাঃ), *দীপন হৃদয়ে বাংলাদেশ*, ২০০৭ পৃ- ৩-৪
১৯. তাপস ভৌমিক (সম্পাঃ), *বলাকা বাংলাদেশ সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি*, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ- ০৪ (সূচিপত্র)
২০. অর্ধেন্দু শেখর গোস্বামী, *এবং জলঘড়ি প্রসঙ্গ বাংলাদেশ*, আগস্ট-নভেম্বর, ২০১৯, পৃ- ০৭ (সূচিপত্র)
২১. মৃদুল হক, সঞ্চিতা দত্ত (সম্পাঃ), *পড়শি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা সংখ্যা*, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, শরৎ ১৪৩০, পৃ- ০৩

২২. বিশ্বজিৎ চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধ*, *সাহিত্যপত্র নহবৎ শারদীয়া সংখ্যা*, অরুণ ইন্দু, সুবোধ ভট্টাচার্য, সুজিত মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃ- ১০২-১০৭
২৩. মৈত্রেয়ী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫১
২৪. অনিল আচার্য (সম্পা), *বন্দী বিবেক*, অনুষ্টুপ, ১৯৭১, পৃ- ৮৪
২৫. সনাতন পাঠক, সাহিত্য সংবাদ, *দেশ*, অশোককুমার সরকার (সম্পা), ৩ জুলাই, ১৯৭১, পৃ- ১০৪১
২৬. অমলেন্দু চক্রবর্তী, মুক্তিযুদ্ধ, *অমৃত শারদীয় সংখ্যা*, তুষারকান্তি ঘোষ (সম্পা), ১৯৭১, পৃ- ৬১
২৭. তপোবিজয় ঘোষ, গল্পের ভূমিকা, *নন্দন*, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ (সম্পা), বৈশাখ, ১৩৭৮, পৃ- ৬৫
২৮. মৈত্রেয়ী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩১
২৯. ড. অরুণ কুমার গোস্বামী, *'বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডঃ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান'*, আন্তর্জালিক সূত্র- https://www.dhakapost.com/opinion/57682, Date- 12.07.25, Time- 8.00 A.M
৩০. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৫৩ বর্ষ, ২৮২ সংখ্যা, বুধবার, ৬ পৌষ, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃ- ০১
৩১. *সাপ্তাহিক পূর্ব্বায়ন*, হাইলাকান্দি, ৫ জানুয়ারি, ১৯৭২, পৃ- ০১
৩২. অমর ভট্টাচার্য, *নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন*, কলকাতা, নয়া ইস্তেহার প্রকাশনী, প্রকাশ- ২০০২, পৃ- ৪০-৪১
৩৩. অরূপ কুমার দাস (সম্পা ও সংকলন), *৬০ সত্তরের দিনপঞ্জি*, বনগাঁ, কবিতা আশ্রম, প্রথম প্রকাশ- ২০২৫, পৃ- ১৪৩-২৪৭
৩৪. *যুগান্তর*, ৩৫ বর্ষ, ১৭২ সংখ্যা, রবিবার, ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭৮, পৃ- ০১
৩৫. আজিজুল হক, *বাহাত্তরের আগে কিন্তু উনসত্তর-সত্তর-একাত্তর*, প্রতিদিন, ২৪ এপ্রিল, ২০০০, পৃ- ০৪
৩৬. *যুগান্তর*, ৩৫ বর্ষ, ১৮১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৭ই চৈত্র ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃ- ০১
৩৭. অরূপ কুমার দাস, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৪৮-২৯০
৩৮. অধৃষ্য কুমার, সত্তর-এর সিদ্ধার্থ সন্ত্রাস ফিরে দেখা, *গণশক্তি*, ১৩ এপ্রিল ১৯৯৬, পৃ- ১-৫
৩৯. কল্যাণ সেন, কলকাতার একাত্তর, *দেশ*, সাগরময় ঘোষ (সম্পা), ১৭ই চৈত্র, ১৩৮৫, পৃ- ২৫-৩০
৪০. কৃষ্ণ চক্রবর্তী, *পশ্চিমবঙ্গ ১৯৭৩*, সাংস্কৃতিক আন্দোলন অতীত ও বর্তমান সংকলন, কলকাতা, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশকাল- ১৯৮০, পৃ- ১৫-২২
৪১. মুনতাসীর মামুন, *সিমলা চুক্তি মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ শিলিগুড়ি থেকে সিমলা*, বাংলাদেশ,

অনন্যা, প্রথম প্রকাশ- ২০২৩, পৃ- ৭৩-৭৫
৪২. *যুগান্তর*, ৩৮ বর্ষ, ২৭৩ সংখ্যা, শুক্রবার, ১২ আষাঢ়, ১৩৮২, পৃ- ০১
৪৩. সন্দীপ দত্ত, ‘ভারতীয় সংস্কৃতি নিগ্রহের ইতিহাস’, *ভারতীয় গণতন্ত্রের (?) স্বরূপ*, তাপস চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সমিতি (এ পি ডি আর), জানুয়ারি ১৯৯৯ (পরিশিষ্ট), পৃ- ৩৫-৩৬
৪৪. প্রবুদ্ধ বাগচী, ‘গান দিয়ে দ্বার খোলাতে পারেন, তাই স্বৈরাচারের শত্রু রবীন্দ্রনাথ’, নাগরিক নেট, আন্তর্জালিক সূত্র- www.nagarik.net, Date- 08.08.25, Time- 8.00 A.M
৪৫. মহর্ষি সরকার, ‘জরুরি অবস্থা (১৯৭৫-৭৭) ও নিষিদ্ধ বাংলা কবিতা’, আন্দর্জালিক সূত্র- Vidyasagar.ac.in, Date- 08.08.25, Time- 9.00 P.M
৪৬. অমল চক্রবর্তী, অনুশাসনীয়, *জন্মভূমির গল্প*, অজিত মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ ঘোষ, চন্দন ঘোষ (সম্পাঃ), কলকাতা, কালেকটিভ পাবলিকেশন, অক্টোবর, ১৯৮৩, পৃ- ১৪৩-১৫২
৪৭. তপোবিজয় ঘোষ, মুক্তিচাই, *চতুষ্কোণ*, বৈশাখ, ১৩৮৪, পৃ- ১৭১-১৮২
৪৮. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পলাতক ও অনুসরণকারী, *নকশাল আন্দোলনের গল্প*, বিজিত ঘোষ (সম্পা), কলকাতা, পুনশ্চ, ২০২০, পৃ- ১৪১-১৪৬
৪৯. শহীদ কাদের চৌধুরী, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের সাধারণ মানুষের ভূমিকা*, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ- ৩৯১-৪০২
৫০. পুণ্ডরীক, দেশে বিদেশে, *অমৃত*, তুষারকান্তি ঘোষ (সম্পা), শুক্রবার, ১৯শে চৈত্র, ১৩৭৭, পৃ- ৬৪৮
৫১. আনোয়ার উল আলম, *রক্ষী বাহিনীর সত্য-মিথ্যা*, বাংলাদেশ, প্রথমা, জুন- ২০১৩, পৃ- ১১-২৮
৫২. *গণকণ্ঠ*, ৩য় বর্ষ, ৮১ সংখ্যা, বুধবার, ৩র বৈশাখ, ১৩৮১, পৃ- ০১
৫৩. ‘বাকশালের গঠনতন্ত্র বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র’, সংগ্রামের নোটবুক, আন্তর্জাতিক সূত্র- www.songramernotebook.com, Date- 29.10.25, Time- 5.00 A.M
৫৪. আহমেদ ছফা, ‘মুজিব শাসনঃ একজন লেখকের অনুভব’, *মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী ইতিহাসের পুর্নপাঠ*, আলতাফ পারভেজ (সম্পা), বাংলাদেশ, ঐতিহ্য, ২০২৩, পৃ- ৫৪৬
৫৫. *যুগান্তর*, ৩৮ বর্ষ, ১২৫ সংখ্যা, রবিবার, ১২ মাঘ, ১৩৮১, পৃ- ০৫
৫৬. ‘মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ শিলিগুড়ি থেকে সিমলা’, *অন্নদাশঙ্কর রায়ের মুক্তিযুগ*, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৮
৫৭. *যুগান্তর*, ৩৮ বর্ষ, ৩২৩ সংখ্যা, রবিবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৮১, পৃ- ০১